কালের কণ্ঠ

তারিখ 25 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

শিক্ষক নিয়োগে রাজনীতি স্বজনপ্রীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে

শরীফুল আলম সুমন ▷

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক আফরোজা পারভীনের একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় গত বছর ব্রিটিশ মাইক্রোবায়োলজি রিসার্চ জার্নালে। গবেষণা প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'এক্সটেন্ডেড স্পেক্ট্রাম বিটা-লেক্টামেস প্রডিউসিং সালমোনেলা স্পেসিস আইসোলেটেড ফ্রম ডাইরিয়াল পেশেন্টস ইন বাংলাদেশ : ক্যারেক্টারাইজেশন অ্যান্ড দেয়ার ডিসিমিনেশন থ্রো কনজোগেশন'। এর সহগবেষক ছিলেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাহমুদুল হাসান। এত বড় একটি গবেষণাকর্মের প্রতিবেদন ব্রিটিশ জার্নালে প্রকাশ হওয়ায় খুশি হওয়ার কথা দেশের শিক্ষকসমাজের। কিন্তু ওই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরপরই গবেষণাটি নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগ ওঠে। আইসিডিডিআরবির সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ড. কায়সার আলী তালুকদার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করে বলেন, 'এই গবেষণা প্রকল্পের পরিকল্পনাটি আমার এবং এ জন্য টাকা দিয়েছে আইসিডিডিআরবি। আফরোজা পারভীন আমার অধীনে থিসিস করার সময় এটি চুরি করেছেন। আমি দুজন গবেষকেরই শাস্তি দাবি করছি।' জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ওই ঘটনায় কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোনো শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে গবেষণা বা থিসিস করার সুযোগ আইসিডিডিআরবি দেবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয়।

দেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গবেষণায় জালিয়াতির ঘটনা অবশ্য এটিই প্রথম নয়। মাঝেমধ্যেই এমন জালিয়াতি বা নকল করার অভিযোগ উঠে থাকে। শিক্ষাবিদদের মতে, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকের গবেষণাই কার্যত 'কপি-পেস্ট'।

এর পেছনের কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষক নিয়োগে মেধা প্রাধান্য না পাওয়ায় শিক্ষকদের পরবর্তী কর্মকাণ্ডেও এর প্রভাব থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষক নিয়োগ হয় রাজনৈতিক পরিচয়, তদবির আর স্বজনপ্রীতির জোরে। এমনও দেখা যায়, শিক্ষাজীবনের সব পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি এমনকি

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

শিক্ষক নিয়োগে রাজনীতি

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

মেধা তালিকার শীর্ষে থাকা প্রার্থীও শিক্ষক হতে পারেন না। আবার কোনো পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়া প্রার্থীও শিক্ষক হয়ে যান। অভিযোগ আছে, যাঁরা রাজনৈতিক প্রভাবে শিক্ষক হতে চান তাঁদের আগে থেকেই বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হয়। আর রাজনৈতিক পরিচয়ে নিয়োগ পাওয়ার পর শিক্ষকরা পাঠদান বা প্রস্তুতিমূলক পড়াশোনার চেয়ে রাজনীতিতে বেশি মনোযোগ দেন। এ ধরনের বেশির ভাগ শিক্ষকই আগে থেকে সংগ্রহ করা লেকচার শিট সামান্য আপডেট করে শিক্ষার্থীদের ধরিয়ে দেন। এভাবেই চালাতে থাকেন ক্লাস।

'জানা যায়, বর্তমানে বেশির ভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য-সমর্থক ও উপাচার্যবিরোধী নামে দুটি পক্ষ থাকে শিক্ষকদের মধ্যে। রাজনৈতিক বিবেচনায় উপাচার্য নিয়োগ হওয়ায় ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী ইউনিয়ন থাকে তাঁর সঙ্গে। ফলে নিয়োগ কমিটিতেও রাখা হয় দলীয় লোকদের। আর রাজনৈতিক পরিচয় ও তদবির ছাড়া নিয়োগ না পাওয়ায় দক্ষ ও মেধাবীরা আসতে পারছেন না বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতায়। যে কজন আসেন তাঁদের মধ্যেও বেশির ভাগ শিক্ষকই পরে বৃত্তি নিয়ে বাইরে গিয়ে আর ফেরেন না।'

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গড়পড়তা বলতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মান কমছে। এর পেছনে প্রথম কারণ রাজনৈতিক। ভিসি নিয়োগ হয় রাজনৈতিকভাবে। তিনি এসেই সব কিছু পলিটিক্যালভাবে দেখেন। আগে একজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতো। কিন্তু এখন ভিসিকে চিনতে কষ্ট হয়। আগে ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতেন। কিন্তু এখন ৯-১০ নম্বর শিক্ষার্থী নিয়োগ পান। শিক্ষক হিসেবে তাঁদের পাল্লাই ভারী। তাঁরা যেহেতু রাজনৈতিকভাবে নিয়োগ পেয়েছেন তাই ক্লাসের চেয়ে মিটিং-মিছিলকেই বেশি গুরুত্ব দেন। এভাবেই তাঁরা পদোন্নতিও পেয়ে যান। তাঁদের শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়ও থাকে না। এখন বড়সংখ্যক শিক্ষক ঠিকমতো ক্লাস নেন না। তৈরি হয়ে ক্লাসে আসেন না। সবমিলিয়ে শিক্ষকদের মান নিম্নমুখী হচ্ছে।'

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগে গত বছর নিয়োগ দেওয়া হয় চারজন শিক্ষক। অথচ ওই বিভাগে ২২টি পদের বিপরীতে ২৩ জন শিক্ষক আগেই নিয়োগ পেয়েছেন। যদিও তাঁদের মধ্যে ৯ জন শিক্ষক আছেন দেশের বাইরে। বিভাগের সব কোর্সের শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫০। ফলে ১৪ জন শিক্ষকের সবাইকে কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। জানা যায়, এর পরও যাঁরা এসব পদে নিয়োগ পান তাঁদের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সাবেক উপাচার্যের ভাগিনা, একজন একটি ছাত্র সংগঠনের সাবেক নেতা এবং এক অধ্যাপকের নিকটাত্মীয়। অন্য দুজনের মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহকারী প্রক্টরের স্ত্রী এবং অন্যজন আরেক সহকারী প্রক্টরের স্বামী। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকদের অভিযোগ, উপাচার্য এবং প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি সিন্ডিকেট ও ডিন নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্যেই এই নিয়োগ দেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩০। শিক্ষার্থী ৩১ লাখ। কিন্তু শিক্ষকতা পেশা মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে পারছে না। আর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। ধরে নেওয়া হয়, সে করতে করতে শিখবে। সেটা বড় ধরনের প্রত্যাশা, কিন্তু তা সম্ভব হয় না। যে হারে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান বাড়ছে, সে হারে মানসম্পন্ন শিক্ষক আমরা জোগান দিতে পারছি না। আর ভালো ছাত্র হলেই যে একজন ভালো শিক্ষক হবেন সেটাও ঠিক নয়। তবে ইউজিসিকে উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তর করলে শিক্ষকদের মানোন্নয়নে আরো বেশি ভূমিকা রাখার সুযোগ তৈরি হবে।'

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার পর তাঁদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন বা সমমানের প্রশিক্ষণ নিতে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষকদেরও বিএডসহ নানা প্রশিক্ষণ কোর্স করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তেমন কোনো প্রশিক্ষণেরই সুযোগ নেই। ফলে একজন শিক্ষার্থী শিক্ষাজীবন শেষ করে শিক্ষক হওয়ার পর তিনি শিক্ষার্থীদের কিভাবে পড়াবেন তা বোঝেন না। আর যাঁদের মেধা কম তাঁদের পক্ষে ঠিকমতো পাঠদান করাটা দুরূহ হয়ে পড়ে। একসময় তাঁরা ক্লাসের প্রতি মনোযোগই হারিয়ে ফেলেন।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মূল কাজ ক্লাসে পাঠদান হলেও সেদিকে মনোযোগ কম অনেকেরই। দলবাজি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাব বিস্তার করার দিকে মনোযোগ থাকে বেশি। কেউ কেউ ক্লাস নেন একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ ছাড়া একাধিক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক হিসেবেও কাজ করেন কেউ কেউ। অনেকেই জড়িয়ে পড়েছেন এনজিওর সঙ্গে। মূলত সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পদটি।

ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু সব শিক্ষকের মানের উন্নয়ন ঘটছে না। তবে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আছে যাদের শিক্ষকরা উচ্চমানসম্পন্ন। আগে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, তাতে শিক্ষক ছিল মাত্র দুই হাজার। ফলে তাঁদের অনেকেই চিনত। কিন্তু এখন ৩৭ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ১৭ হাজার। তাঁদের মধ্যে পাঁচ হাজার শিক্ষক উচ্চমানসম্পন্ন। এক-দুই হাজার বিদেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও চাকরি করতে সক্ষম। তবে কিছু ইউনিভার্সিটিতে রেজাল্ট বিবেচনায় না নিয়েই শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে আরো অ্যালার্ট হওয়া উচিত।'

ইউজিসির মতে, রাজনৈতিক বিবেচনায় পদোন্নতি পাওয়ায় গবেষণা ও প্রকাশনা নিষ্প্রভ : ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগও আনা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় রাজনৈতিক বিবেচনায় পদোন্নতি পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা ও প্রকাশনা অনেকটা নিষ্প্রভ থেকে যাচ্ছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি একাডেমিক সেশনে (শিক্ষাবর্ষে) প্রতিবছর ৩০ থেকে ৩২ সপ্তাহ ক্লাস হয়। বাকি সময় ছুটি থাকে। ক্লাস নেওয়া ছাড়া গবেষণা, প্রশাসন ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনা ইত্যাদি কাজের জন্য কত সময় একজন শিক্ষককে তাঁর কর্মস্থলে উপস্থিত থাকতে হবে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান নেই। ফলে অনেক শিক্ষকই বেশির ভাগ সময় কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। এ ছাড়া কিছুসংখ্যক শিক্ষক একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে অধিকতর সময় ব্যয় করেন।

ইউজিসির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০১৪ সালে ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কর্তব্যরত শিক্ষক ছিলেন ৯ হাজার ৪৬৪ জন। বাকি এক হাজার ৬৪৫ জন ছিলেন শিক্ষাছুটিতে, প্রেষণে ১৮৯ জন, বিনা বেতনে ৯৪ জন, অননুমোদিতভাবে ছুটিতে ছিলেন ১৩ জন এবং চুক্তিভিত্তিক অন্যান্য পর্যায়ে ছিলেন ৬৪২ জন। অর্থাৎ মোট শিক্ষকের ২১ শতাংশই কর্তব্যে অনুপস্থিত ছিলেন।

জানা যায়, বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে যাওয়া শিক্ষকরাও প্রথমে যান শিক্ষাছুটিতে। তারপর তাঁদের অনেকেই ওই দেশে থাকেন বিনা বেতনে বা অননুমোদিত ছুটিতে। এভাবেই যে কয়জন মেধাবী শিক্ষক যোগদান করেন তাঁরা আর দেশে থাকেন না।

জানা যায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ হয় ইচ্ছামতো। বোর্ড অব ট্রাস্টিজের পছন্দ অনুসারে নিয়োগ দেওয়া হয় শিক্ষক। শিক্ষকরা ক্লাসে পড়াতে পারবেন কি না সে বিষয়ে যাচাই-বাছাই করে না বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়। মাত্র ২৩ বছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৯১টিতে দাঁড়ালেও শিক্ষকদের মানের উন্নয়ন হচ্ছে না। আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মাঝেমধ্যে দু-চার দিনের প্রশিক্ষণ পেলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাও পান না। ক্লাসে শিক্ষার্থীদের ভরসা একই রকমের লেকচার শিট। সেখানে গবেষণাও নামমাত্রে। ফলে বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখার মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে খোদ ইউজিসিই।

অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা প্রদান করলেও তাদের নিজস্ব কোনো শিক্ষক নেই। সরকারি কলেজে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার এবং বেসরকারি কলেজে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা পড়ান। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়ানোর জন্য তাঁরা কোনো প্রশিক্ষণ পান না। আর এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে টাকার বিনিময়ে পরিচালনা কমিটি শিক্ষক নিয়োগ দেয়। সেখানে মেধা ও দক্ষতার কোনো স্থান নেই। ফলে বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের মান নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ শিক্ষাবিদদের মধ্যে।